প্রতিধ্বনি the Echo
Pratidhwani the Echo
*A Peer-Reviewed Indexed International Journal of Humanities & Social Science*
**Published by: Dept. of Bengali**
**Karimganj College, Karimganj, Assam, India**
**Website: https://www.thecho.in**
**ISSN: 2278-5264 (Online)**
**ISSN: 2321-9319 (Print)**

# মধ্যযুগের নির্বাচিত কাব্যে ভাষা বৈচিত্র্য

## ড. বর্ণালী ভৌমিক (ঘোষ)

**Abstract**

*This citation tries to analyze the ascent and speech expressions in the Bengali language during the era of the Medieval age, based on study of a few literary work, such as 'Sri Krishna Kirtan', 'Baishnava Padaboli', 'Anudito Ramayana', 'Mahabharat', 'Sri Krishna Bijoy', 'Jiboni Sahityo', 'Mongol Kabya', 'Arakan Rajsavar Kabya' etc covering upon the period from 1350 to 1760. The Medieval linguistic aspects containing the origin and expression of important loan words, translation loan words, hybrid words and words of many Bengali dialects have been depicted and interpreted in this paper. Through discussion of the various linguistic aspects, the paper tries to highlight that medieval age holds a unique place as concerns development of Bengali Language.*
*Key Words: Medieval age, Bengali language, Linguistic aspects.*

মানুষের কথ্যভাষা চিরপ্রবাহমান, স্রোতের মতই উপল বন্ধুর পথে প্রবাহিত হয়ে, প্রাচীন মধ্য পরিশেষে আধুনিক যুগে মানুষের মুখের জীবন্ত ভাষা নিজস্ব গতিতে চলিষ্ণু। প্রাচীন-মধ্য-আধুনিকতার রূপ পরিত্যাগ করতে করতে ভাষা বর্তমানের রূপ পরিগ্রহণ করেছে। তাই মধ্যযুগের ভাষা বৈচিত্র্য আলোচনা প্রসঙ্গে প্রথমেই ভাষা সম্পর্কে দৃষ্টিপাত করা প্রয়োজন। ভাষা বিজ্ঞানীগণের মতে, মানুষের বাগ্‌যন্ত্রে থেকে নিঃসৃত, অর্থবোধক, ধ্বনি বা ধ্বনি সমষ্টি, যা চিহ্ন প্রতীকবাহী এবং যার দ্বারা একটা নির্দিষ্ট সম্প্রদায়ের মানুষ বাক বিনিময় করে, তাকে ভাষা বলা হয়। অর্থাৎ ভাষা হল অন্তরের আত্মার সঙ্গে সংযুক্ত, কারণ 'বাক' হল 'ব্রহ্ম' আর ব্রহ্ম সাধনার দ্বারাই ভাষা ব্যবহার সম্ভব বলে দার্শনিকগণ ধারণা করেন। ভাষার মধ্যে দিয়েই সমাজের বিভিন্ন স্তরের মানুষেরা যেমন আপনভাবনা, মননজাত চিন্তার রূপ প্রকাশ করে; ঠিক তেমনই ভাষার মধ্যে দিয়েই জন্ম লাভ করে মানুষের সমকাল চেতনাময় একাধিক 'সৃষ্টি' – অর্থাৎ সাহিত্যসম্ভার। আদিকাল থেকেই এই নিয়ম চলে আসছে। মানুষ আপন ভাবনাকে, অন্তর্নিহিত মনন-ইচ্ছাকে প্রকাশ করবার জন্যে ভাষাকেই মাধ্যমরূপে চিহ্নিত করেছে এবং তা সাহিত্যের মাধ্যমে রূপ প্রকাশ ঘটিয়েছে। ভাষা তাই স্রষ্টার যেমন সৃষ্টি সম্পদ তেমনি সমকালের ঐতিহাসিক দলিলও বটে।

আধুনিক যুগের সঙ্গে মধ্যযুগের আদর্শের, ভাবনার, প্রচলিত রীতিনীতি তথা সমগ্র জীবনবোধেরই রয়েছে দূরতিক্রম্য ব্যবধান। তাই স্বাভাবিক পরিবেশে প্রেক্ষাপটে যে সকল কাব্যসম্পদ সৃষ্টি হয়েছে, আধুনিক যুগে ভিন্ন জীবনবেদ সম্পূর্ণ ভিন্ন ভাবনার সাহিত্যকে জন্ম দিয়েছে। তাই ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে দাঁড়িয়ে মধ্যযুগের কাব্যসম্ভারের ভাষাকে যাচাই করতে গেলে স্বাভাবিকভাবে তৎকালীন রাজনৈতিক, সামাজিক জীবন

বিশ্লেষণ অবশ্যম্ভাবী হয়ে পড়ে। শুধু তাই নয়, মধ্যযুগের মধ্য পর্যায়ের চৈতন্যদেবের আবির্ভাবকে কেন্দ্র করে বঙ্গভূমির প্রেক্ষাপটে, সমাজ সাহিত্যে যে রেনেসাঁস সূচিত হয়েছিল, তাও অস্বীকার করা যায় না। ফলতঃ চৈতন্যদেবকে কেন্দ্র করে সমগ্র মধ্যযুগেও ভাষা বিবর্তিত হয়ে পড়েছিল। মধ্যযুগের সময়সীমা নির্ধারণ করা যায় আনুমানিক কিছু সাল তারিখের নিরিখে। কারণ, একটা যুগ থেকে অপর যুগের বিবর্তন কখনই সাল-তারিখের নির্দিষ্ট সময়সীমা মেনে হয় না। পরিবর্তিত যুগ সম্পর্কে ধারণা জন্মায় পূর্বযুগের মূল্যবোধ ভাবনা ইত্যাদির বিবর্তন সাপেক্ষে। এই পরিবর্তন ধীর গতিতে সংঘটিত হয়েও, নির্দিষ্ট সময় পরিমাপের মধ্য দিয়ে তা ধরা যায় না বলে তা অনুমানের ভিত্তিতে মধ্যযুগের যুগ বিভাগ করা হয়ে থাকে। তবে এই অনুমান ভিত্তিক ব্যাপ্তিকালও তর্কাতীত। প্রায় ৪০০ (চারশ) বছরের মধ্যবাংলার ব্যাপ্তিকালের সূচনা হয়েছে ১২০০-১২০৪ খ্রীষ্টাব্দে থেকে। অর্থাৎ তুর্কী আক্রমণের (১২০৩-০৪) সময়কালে থেকে। তবে ১৩৫০ খ্রীষ্টাব্দে পর্যন্ত বাংলা সাহিত্যের কোন তথ্য বা প্রমাণ আমরা পাইনি। তাই ১৩৫০ খ্রীষ্টাব্দে থেকেই মধ্যযুগের সূচনা এবং ব্যাপ্তি ১৭৬০ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত, এর মধ্যে আদি মধ্যযুগ এর সময়পর্ব আনুমানিক ১৩৫০-১৫০০ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত এবং অন্ত্যমধ্যযুগ ১৫০০-১৭৬০ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত। শ্রী চৈতন্যদেবের আবির্ভাব (১৪৮৬-১৫৩৩খ্রীঃ) লগ্নটি মধ্যযুগকে এই দুই উপপর্বে বিভক্ত করে দিয়েছে। ফলে স্বাভাবিকভাবে এই বিস্তারিত লগ্নে একাধিক কাব্য সম্ভারের মধ্যে ভাষার বৈচিত্র্যময় প্রকাশ ঘটে গেছে। তবে, মধ্যযুগের একাধিক রচনার মূল পুঁথিই কালের গর্ভে নিমজ্জিত হয়েছে এবং তৎপরিবর্তে অষ্টাদশ শতকে লিপিকরগণের নকল করা পুঁথির সংখ্যাধিক্যে ধরা পড়েছে ভাষার বৈচিত্র্যময় প্রকাশ নৈপুণ্যতা।

বিস্তারিত মধ্যযুগের সময়পর্বে কাব্যসম্ভারের বৈচিত্র্যতাও অনবদ্য। বড়ু চন্ডীদাসের আখ্যানকাব্য 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন'-এর পাশাপাশি রচিত হয়েছে মঙ্গলকাব্য, অনুবাদ সাহিত্য, জীবনী সাহিত্য, পদাবলীর সাহিত্য (বৈষ্ণব, শাক্ত), প্রণয় উপাখ্যান ইত্যাদি। প্রতিটি কাব্যেই তৎযুগীয় ভাষার লক্ষণ যেমন স্পষ্ট হয়েছে, তেমনি সমাজ রাষ্ট্রের ইতিবৃত্ত ধরা পড়েছে। অর্থাৎ কখনও লৌকিকদেব-দেবীকে আশ্রয় করে মধ্যযুগের কবিগণ মানসিক শান্তি খুঁজেছেন, কখন বা সমাজের আদর্শ প্রতিষ্টার প্রচেষ্টায়, ঐক্যবদ্ধ সমাজ গড়তে অনুবাদ সাহিত্যের জন্মলাভ ঘটেছে, কখনও বা পরমপুরুষের জীবনলীলায় বাঁধা পড়েছে মানুষের আধ্যাত্মচিন্তা, কখনও বা রাধাকৃষ্ণের আধ্যাত্মিক প্রেমলীলায় বৈষ্ণব সমাজ পঞ্চরসের সাধনা করেছে, কখনও বা হরগৌরীর সংসার জীবন কথা তুলে ধরে চিরকালীন গার্হস্থজীবনের নাট্যকথাকে তুলে ধরে, সমাজের বুকে পারিবারিক বন্ধনকে প্রতিফলিত করতে চেয়েছেন কবিগণ। সমগ্র মধ্যযুগে উক্ত কাব্যভাবনাকে মধ্যে দিয়ে কবিগণের মনন ঋদ্ধ চিন্তা চেতনার মাধ্যমরূপে ভাষা প্রকাশিত হয়েছে। তাই স্বাভাবিকভাবে যুগ ভেদে ভাষা বৈচিত্র্যময় হয়ে উঠেছে।

প্রাচীন বাংলার নির্দশন চর্যাপদের পর বড়ু চন্ডীদাসের 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন'-এ ভাষার পরিণত সার্থকরূপ দেখা যায়। কাব্যটি আদি-মধ্যযুগের ভাষার লক্ষণকে অঙ্গে ধারণ করে বড়ু চন্ডীদাসের কবি কৃতিত্বতাকে স্মরণ করায়। আদি-মধ্যযুগে, আনুমানিক চতুর্দশ-পঞ্চদশ শতকে বাংলার বৈচিত্র্যময় রূপ এতে স্পষ্ট হয়েছে। কাব্যটির মধ্যে মৌলিক বেশ কিছু ভাষাতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য যেমন প্রকট হয়েছে, তেমনি এর ভাষায় অসংখ্য তৎসম শব্দ, অর্ধতৎসম শব্দ, তদ্ভব শব্দ, দেশী শব্দ, পুরনো বাংলা শব্দের ব্যবহারে কাব্যটি অলংকৃত হয়ে উটেছে। আবার ভাষায় ব্যবহৃত ক্রিয়াপদগুলি ও সর্বনাম পদগুলিতেও বৈশিষ্ট্যপূর্ণ মৌলিক প্রকাশ সাধিত হয়েছে। নাসিক্য, মহাপ্রাণ ব্যঞ্জনের দ্বারা গঠিত সর্বনাম পদগুলিও বিশিষ্ট হয়ে উটেছে। তৎসম শব্দের প্রাচুর্যতায় ধরা পড়েছে 'কেশ', 'ব্রহ্মা', 'স্তুতী', 'শঙ্খ', 'কৃষ্ণ', 'ঔষ্ঠ', 'কমল', দন্ত' ইত্যাদি শব্দগুলি। দৃষ্টান্ত ---

ক। "সুরেখ সুপুট নাসা নয়ন কমল।
কামান সদৃশ শোভে ভ্রাই যুগল।"
খ। "যে কৃষ্ণ রথিন দৈবকী উদরে।
সেই শঙ্খ চক্র গদা শারঙ্গ ধরে।"
গ। "ব্রহ্মা সব দেব লাঁগেলান্তি সাগরে।"
ঘ। "কুসুমিত তরুগণ বসন্ত সমত্র।"

ঙ। "চরণ থলকমল মন্থর গমনে।"

শুধু তৎসম শব্দই নয়, বেশ কিছু অর্ধতৎসম শব্দের প্রকাশ ঘটেছে 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' কাব্যে। যেমন --- 'পরকার', 'বিমরিষে', 'তরাসে', 'দুসহ', 'ক্ষেমা', 'সপনে' ইত্যাদি। আবার লোকমুখে প্রচলিত সহজ, সরল, জীবন্ত ভাষা প্রকাশ করার প্রয়াসেই বোধ হয় একাধিক তদ্ভব শব্দের কবি প্রকাশ ঘটিয়েছেন। এই সকল তদ্ভব শব্দের ব্যবহার তৎযুগে লোকসমাজে প্রচলিত ছিল। যেমন --- 'হাথ', 'নেই', 'আজি', 'গোঠ', 'কুম্ভার' ইত্যাদি। আবার 'খাঁখার', 'ঝাট' শব্দগুলিও 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন'-এর ভাষা বৈচিত্র্যে পেয়ে থাকি। বেশ কিছু ধ্বন্যাত্মক শব্দ কবি যেমন ব্যবহার করেছেন, তেমনিই পুরনো বাংলা শব্দ ব্যবহারের মধ্যে দিয়ে 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন'-এর ভাষা বৈচিত্র্যপূর্ণ হয়ে উঠেছে। সমগ্র 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' কাব্যে 'আকাশ', 'কাজ', 'দুধ', 'মেঘ', 'খোপা', 'মাছ', 'ঘর', 'পথ' ইত্যাদি বিশেষ্য শব্দগুলির যেমন প্রয়োগ ঘটেছে তেমনি 'কামান' নামক একটি ফার্সী শব্দকেও কাব্য মধ্যে কবি প্রয়োগ করেছেন। 'বামন', 'বিকট', 'বিকল', 'সরস', 'পাকা', 'বাটুল' ইত্যাদি বিশেষণের পাশাপাশি 'সব', 'তোর', 'তোকে', 'তার' ইত্যাদি সর্বনাম পদগুলিকে কবি প্রয়োগ করেছেন 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন'-এর ভাষায়; আবার 'আহ্মে', 'তুহ্মে', 'আহ্মার', 'তোহ্মার' – সর্বনামের এই প্রাচীনতত্ত্বের রূপগুলিও কাব্যের মধ্যে প্রকট হয়েছে। আদি মধ্যযুগের অন্যতম কাব্য শ্রীকৃষ্ণকীর্তন এর ভাষাবৈচিত্র্য বিশ্লেষনে, কাব্যে প্রান্ত একাধিক তৎসম, তদ্ভব, আগন্তুক, শব্দ প্রকাশের মাত্রাধিক্যই স্পষ্ট হয়ে উঠে। অথচ মধ্যযুগেবড়ু চন্ডীদাসের 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' কাব্যটির সমান্তরালে অপর আর একটি সম্পদরূপী সাহিত্য, শাহ মুহম্মদ সগীর বিরচিত 'ইউসুফ জোলেখা' – এর ভাষা বৈচিত্র্য উপেক্ষনীয় নয়। কাব্যটি আজম শাহের (১৩৮৯-১৪০৯ খ্রীঃ) রাজত্বকালে রচিত হয় বলে অনেক সমালোচকই সুচারু মন্তব্য প্রকাশ করেছেন। তবে রোমান্টিক প্রণয় উপাখ্যানরূপী 'ইউসুফ জোলেখা' –এর ভাষা নিরীক্ষণে সমালোচকগণ স্থির সিদ্ধান্তে এসেছেন যে 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন'-এর পরবর্তী এবং শ্রীকৃষ্ণবিজয়'-এর পূর্ববর্তী বৈচিত্র্যময় ভাষার প্রকাশ 'ইউসুফ জোলেখা'-য় স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। তাই স্বাভাবিকভাবে এই কাব্যেও তৎসম শব্দের আরবী, ফার্সী শব্দ প্রয়োগ ঘটেছে। যেমন ---

ক। "পরম ঈশ্বর ভানে বুলিলেখ বন্ধু।
সপ্ত স্বর্গ মুক্তি পাইল তান পদী বিন্দু।।"
খ।"বুদদি বৃহস্পতি সময বিক্রমে কেশরী।
পৃথিবী মন্ডল মধ্যে একদন্ড ধারী।।"
গ। 'কনক জড়িত পাট রতনে মন্ডিত।।'
ঘ। "তনুকান্তি নির্মল কমল কলাবতী
প্রভাতে উদয় যেহ্নে সবুজ দীপতি।।"

এছাড়াও 'স্বর্গ', 'ইন্দ্র', 'পতি', 'অমৃত', 'তৃষ্ণা', 'পক্ষী', 'তরঙ্গ', 'চম্পা', 'উল্লাস', 'তপ্ত', 'নৃপমণি', 'অগ্নি', 'নয়ন' ইত্যাদি শব্দগুলি শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের মতই 'ইউসুফ জোলেখা'-র ভাষা শ্রীকৃষ্ণকীর্তন এর থেকে স্বতন্ত্রমন্ডিত ও অনেকাংশে মৌলিক। কারন, 'প্রাকৃতভাবাপন্ন' বেশ কিছু শব্দকে কবি এ কাব্যে ব্যবহার করেছেন, যা 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন'-এ লভ্য নয়। যেমন – 'হাকলি বিকলি' শব্দটি কবি দেহের অস্থিরতা বা চাঞ্চল্য বোঝাতে ব্যবহার করেছেন, আহ্বানকারীকে কবি 'ডাকোয়াল' শব্দটির মধ্যে দিয়ে বুঝিয়েছেন। 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন'-এ 'লাঠি' শব্দটি লভ্য হলেও 'ইউসুফ জোলেখা'-য় 'লড়ি' রূপেই শব্দটি অর্থ প্রকাশ করেছেন। কোন বস্তু তার অবস্থা থেকে ক্ষয়প্রাপ্ত হয়ে বা রূপান্তরের মধ্যে দিয়ে অন্য অবস্থায় নিজেকে প্রকাশ কররে কবি বিষয়টি 'ঘাটিল' শব্দটির মধ্যে দিয়ে অর্থবহ করে তুলেছেন। আর এভাবেই সত্য হয়েছে 'সাচা', 'কেমন' হয়েছে 'কমন', 'ভাগ্য' হয়েছে 'ভাগ' উজ্জ্বল হয়েছে 'উঝর'। প্রসঙ্গত আরবী, ফার্সী শব্দের মধ্যে একাধিক স্থানে ঈশ্বরের দূত বা পয়গম্বর বোঝাতে 'নবী' শব্দটিকে কবি বারংবার ব্যবহার করেছেন। 'ফরিস্তা', 'জান্নাৎ', 'কাফির', 'মালিক', 'আসরফি' ইত্যাদি আরবী-ফার্সী শব্দও এসেছে কাব্যটির মধ্যে। অর্থাৎ তৎসম, তদ্ভব শব্দের পাশাপাশি আগন্তুক শব্দরূপে আরবী-ফার্সীর প্রচলনও ঘটে গেছে আদি মধ্যযুগের ভাষায়। অর্থাৎ যুগ পরিবর্তনে, রূপ রূপান্তরের মধ্যে দিয়ে কাব্যভাষায় বৈচিত্র্য এভাবে ধরা পড়েছে।

মধ্যযুগের বাংলা কাব্য সাহিত্য সম্ভারের অপর শাখা অনুবাদ সাহিত্য। এই শাখার উজ্জ্বলতম ব্যক্তিত্ব 'শ্রীকৃষ্ণবিজয়' প্রণেতা কবি মালাধর বসু। সংস্কৃত ভাগবতের অনুবাদে, শ্রীকৃষ্ণের বৃন্দাবনে মধুরলীলাকে দার্শনিক তত্ত্ব-ব্যাখ্যানের আলোকে দুর্বোধ্য করে তোলার পরিবর্তে শ্রীকৃষ্ণের বীরত্বব্যঞ্জিত রূপ ও শ্রীকৃষ্ণকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠা ঘটনাবলীর প্রতিই সাবলীল সহজ কবিত্বধর্মী ভাষায় কাব্যটির ভাবনা প্রসারতা লাভ করেছে। ফলে তৎযুগীয় 'লৌকিক ভাষা'-য় কবি তথ্য সমৃদ্ধ ভাবনার পাশাপাশি পাঠক মনে আদর্শ প্রচেষ্টার সংকল্পেই কাব্যটির ভাষা প্রাণোজ্জ্বল হয়ে উঠলেও কবি নিজস্ব বা মৌলিক শব্দের তুলনায় একাব্যে তৎসম, অর্ধতৎসম, তদ্ভব শব্দের মধ্যে দিয়ে বিস্তারিত অনুবাদ কর্মটি সমাপ্ত করেছেন। কাব্যভাষা অলংকৃত, শব্দ সুষময় অভিজাত্যপূর্ণ হয়ে উঠেছে কাব্যটিতে অধিক ব্যবহৃত এই সংস্কৃত গন্ধী শব্দের রূপরেখাকে অনুসরন করেই। শ্রীকৃষ্ণকে অবতাররূপী দেখানোর প্রচেষ্টাতেই তাই শ্রীকৃষ্ণবিজয় এর ভাষা হয়ে উঠেছে গাম্ভীর্যপূর্ণ; পাশাপাশি কৃত্তিবাস ওঝার 'শ্রীরাম পাঁচালী' জনসমক্ষে পাঠকের মনে অনেক বেশী আদৃত ও জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে স্বচ্ছন্দ, সাবলীল দেশী শব্দের অধিক ব্যবহারে। মধ্যযুগের অনুবাদ সাহিত্য ধারায় তাই মালাধর বসুর 'শ্রীকৃষ্ণবিজয়' এবং কৃত্তিবাস ওঝার 'শ্রীরাম পাঁচালী'কে সমান্তরাল রেখে যদি উভয়ের কাব্যভাষার বৈচিত্র্য ময়তার প্রতি দৃষ্টিপাত করা যায়, তাহলে একথা নিশ্চিত হয় সে, অনুদিত রামায়ণের সহজবোধ্য দেশী শব্দের বহুল্যতার জন্যই কাব্যটি প্রতিটি গৃহের সম্পদ হয়ে উঠেছে। কারণ, বীরত্বব্যঞ্জক রামমহিমাকে কীর্তন করা কৃত্তিবাসের উদ্দেশ্য ছিল না; সহজবোধ্য ভাষায় শ্রীরামচন্দ্রের আদর্শ মহিমাকে সুপ্রতিষ্ঠিত করার উদ্দেশ্য এবং এক ঐক্যবদ্ধ সমাজ গড়ে তোলার উদ্দেশ্যেই বাল্মীকির সংস্কৃত রামায়ণকে সহজবোধ্য করে ভাবানুবাদ করেছেন কৃত্তিবাস। পক্ষান্তরে, মালাধর বসুর 'শ্রীকৃষ্ণবিজয়'-এ শ্রীকৃষ্ণের বীরত্বব্যঞ্জক বীর্যবান রূপচ্ছবিই, ফুটে উঠেছে অধিক ব্যবহৃত তৎসম শব্দের প্রাচুর্যে এবং শ্রীকৃষ্ণের ঐশ্বরিক রূপ বর্ণনার ক্ষেত্রে - ফলে 'শ্রীকৃষ্ণবিজয়' ও 'শ্রীরাম পাঁচালী'র ভাষায় এক সূক্ষ্ম প্রভেদ রেখা তৈরী হয়েছে। ফলত 'শ্রীকৃষ্ণবিজয়' অপেক্ষা কৃত্তিবাসী রামায়ণ অনেক বেশী আদৃত হয়ে উঠেছে। উভয় কাব্যেরই তুল্যমূল্য কিছু দৃষ্টান্ত দেওয়া যায় এভাবে ---

১।। 'শ্রীকৃষ্ণবিজয়'-এর ভাষা :

'সত্যভামা বিবাহ' থেকে গৃহীত

"স্বভাবে সুন্দর কৃষ অতি মনোহর।
নানা রত্নে সোভিত জেনে পঞ্চস্বর।।
ত্রৈলোকসুন্দরী কন্যা সতি সত্যভামা।
রতি জিনি রূপ তার লাইক উপমা।।
সুভক্ষণে সুভজাগে দোহে দরসন।
মনিকাঞ্চন জেনে হইল মিলন।।
সত্রাজিত রাজা তবে বৈসা কন্যাদান।
হস্তি অশ্বদান দিল জৌতুক বিধান।।
জৌতুক আনিঞা দিল সেমন্তক মনী।
পালিহ আমার সুতা দেব চক্রপাণি।।"

তুলনীয়, 'শ্রীরাম পাঁচালী'র ভাষা : 'সুন্দরা' কান্ড থেকে গৃহিত

"আমি সতী তাঁহার নন্দিনী।
দশরথ সুত রাম নবদুর্ব্বাদল শ্যাম,
বিবাহ করেন পণে জিনি।
শুভ বিবাহের পর গেলাম শ্বশুর ঘর,
কত মত করিলাম সুখ।
শ্বশুরের হে যত শাশুড়ীগণের তত
নাই তথা ছিল কোন দুখ।।'

২।। 'শ্রীকৃষ্ণবিজয়'-এর ভাষা 'কৃষন কর্তৃক ব্রাহ্মণের মত পুত্রের জীবনদান' অংশ থেকে গৃহীত।

"মহাঘোর অন্ধকার দেখি চক্রপাণী।
চক্রে কাটি অন্ধকার করে খানি খানি।।
অন্ধকার কাটি কাটি জাত্র দুইজনে।
ব্রহ্মান্ডে উত্তম স্থান উত্তম ভুবনে।।
তার অভ্যন্তরে জাত্র কৃষ্ণ অর্জ্জুনে।
দেখিল পুরুষ বর কমললোচনে।।
সঙ্খ, চক্র গদা পদ্ম বনমালাধর।
চতুর্ভূজ রূপ তার সাম্য কলেবর।।
উজ্জ্বল দেহের কান্তি বিষ্ণু অবতার।"

তুলনীয়, 'শ্রীরাম পাঁচালী'র ভাষা : 'হনুমান কর্তৃক ঔষধ আনয়ন ও শ্রীরাম-লক্ষণ এবং বানরগণের প্রাণদান' অংশ থেকে গৃহীত।

"লাফ দিয়া বীর গিয়া উঠিল আকাশে।
লঙ্কাপুরে উপনীত চক্ষুর নিমিষে।।
বিশল্যকরণী আর সুবর্ণকরণী।
অস্থিসঞ্চারণী আর মৃতসঞ্জীবনী।।
এই চারি ঔষধ লইয়া হনুমান।
চারিদ্বারে ভ্রমণ করেয় স্থানে স্থান।।
চারি ঔষধের ঘ্রাণ যত দূর যায়।
বানর কটক সব উঠিয়া দান্ডায়।।
নিদ্রাভঙ্গে উঠে যেন মেলিয়া নয়ন।
সেইরূপে উঠিলেন শ্রীরাম-লক্ষণ।।"

রামায়ণের ভাষা এই "শ্রীকৃষ্ণকীর্তন" বা "শ্রীকৃষ্ণবিজয়"-এর মত আলংকারিক বা দার্শনিক তত্ত্ব সমৃদ্ধ নয়। এভাষা জনগণের মনের আত্মাকে স্পর্শ করে। তাই সহজ, সরল, মৌখিক শব্দ, দেশী শব্দের মধ্যে দিয়ে রামায়ণের অনেক দুরূহ ভাবনাও সহজবোধ্য প্রাণোজ্জ্বল হয়ে উঠেছে এই ভাষার গুণেই। একাধিক ধ্বন্যাত্মক শব্দের খোলস ছেড়ে রামায়ণের ভাষায় জেগে উঠেছে প্রাণের জোয়ার।

বিস্তারিত মধ্যযুগের কালপর্বে শ্রীচৈতন্যদেবের আবির্ভাব বৈষ্ণব সাহিত্যের ধারায় তত্ত্ব দর্শনের ঐতিহ্য নবদিগন্তের উন্মোচন করে ছিল অর্থাৎ পরমপুরুষ চৈতন্যদেবের প্রভাবে সমাজ ধর্ম-সাহিত্য শুধু প্রভাবিত হয়নি তার দার্শনিক তত্ত্বভাবনার আলোকেও আরাধ্য কৃষ্ণরাম জপকরে বহু পতিত এর মুক্তি ঘটেছিল। নবদ্বীপকে কেন্দ্র করেই তাঁর রাধাকৃষ্ণ সাধনা সীমাবদ্ধ থাকেনি। ভারতবর্ষের বিস্তারিত ক্ষেত্রে আষাঢ়ের নব পুঞ্জীভূত মেঘের মতই চৈতন্যদেবের ভাবনা ও চিন্তা চেতনার জাগরণ উদ্দীপনার সঞ্চার করেছিল। ফলে, চৈতন্য জীবনকে কেন্দ্র করে জীবনী সাহিত্য রচনার অভিপ্রায় সাধন করেছিলেন একাধিক কবিপ্রবর। এই সকল জীবনী সাহিত্যগুলিতে প্রতিফলিত প্রেক্ষাপট, ভাবধারা সর্বোপরি চৈতন্যদেবের জীবনালোকের বিচ্ছুরণ সমগ্র মধ্যযুগের সাহিত্য সম্পদ হয়ে রইল। চৈতন্যজীবনী সাহিত্যে তাই রূপ পেল সমাজের একান্ত প্রচলিত ও প্রচারিত বৈষ্ণবীয় ভাষা; যে ভাষা শুধুমাত্র বৈষ্ণব সমাজেরই ভাষা রূপে গৃহীত হলেও পরবর্তীকালে তা হয়ে উঠেছিল সর্ব সাধারণের কৃষ্ণনাম জপ করার নিজস্ব শব্দ সম্ভার। পরমপুরুষ চৈতন্যদেবের আবির্ভাবালগ্নের পাশাপাশি ষড় গোস্বামীদের দার্শনিক চেতনালব্ধ জ্ঞানগর্ভ ভাষার প্রকাশ একাধিক আকর গ্রন্থে প্রতিষ্ঠা পেয়েছিল, তেমনি গোস্বামীদের মাহাত্ম্যব্যঞ্জক কৃষ্ণলীলার স্পর্শ লেগেছিল সমাজের বুকে। ফলে বৈষ্ণব সমাজের প্রচলিত ভাষা হয়ে উঠেছিল শাশ্বত। চৈতন্যদেব স্বয়ং ছিলেন শ্রীবিষ্ণু, কৃষ্ণের অবতার, জগন্নাথ রূপ দেবলোকের শক্তি স্বরূপ, যার জীবনী প্রতিষ্ঠা পেয়েছিল জীবনী সাহিত্যের মধ্যে। তাই জীবনী সাহিত্যগুলিতে যেমন প্রচুর তৎসম শব্দ ছড়িয়ে ঠিক তেমনি অর্ধতৎসম, গ্রামাবাংলার মুখের ভাষাও রূপ

পেয়েছে এই সাহিত্যগুলিতে। দৃষ্টান্ত হিসাবে বৃন্দাবন দাস রচিত 'চৈতন্য ভাগবত' থেকে কিছু চরণ উদ্ধার করা যায়।

১।। "ব্রহ্মা দিও তোমার ক্রোধের নহে পাত্র।
সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় তোমার লীলা মাত্র।।"
২।। "জয়ধ্বনি পুষ্পবৃষ্টি হইল তখন।
চতুর্দিগে মহাহরিধ্বনি কোলাহল।।"
৩।। "যে প্রেমারহংকার শুনিঞা কৃষ্ণনাথ।
ভক্তি বেশে আপনেই হইলা সাক্ষাত।।"
৪।। "অনন্ত ব্রহ্মান্ডরূপে দেখে সেই ক্ষণে।
চন্দ্র সূর্য সিন্ধু গিরি নদী উপবনে।।"

অতিসাধারণ কথ্য ভাষায় দেশি শব্দের বেশ কিছু সাধারণ উক্তি দিয়ে শ্রীবৃন্দাবন দাস 'চৈতন্য ভাগবত' চয়ন করেছেন; ফলে 'গুরু', 'শিষ্য', 'প্রেমনিধি', 'প্রভু', 'সংকীর্ত্তণ', 'হরিহরি', 'নরনারায়ণ', 'মদনমোহন', 'গৌরাঙ্গ', 'মোহনরূপ', 'বৈকুণ্ঠ', 'ঐশ্বর্য', 'পাতকীপাবন' প্রভৃতি একান্ত প্রচলিত বৈষ্ণবীয় কৃষ্ণনাম সংক্রান্ত ভাষার ব্যবহার করেছেন। এছাড়া শ্রীচৈতন্য সমসাময়িক 'শিষ্য-শিষ্যা', 'গোসাঞি', 'আচার্য' পরিষদ-এর পরিচয়ের প্রসঙ্গও বৈষ্ণব জীবনী সাহিত্যের সম্পদ হয়েছে। রত্নগর্ভ, আচার্য, রঘুনাথ পন্ডিত, রামপন্ডিত, সুন্দরানন্দ ঠাকুর, সনাতন 'গোস্বামী', 'হরিদাস ঠাকুর' প্রমুখের ভাবনা ও চেতনালব্ধ দার্শনিক মনন বারংবার একাব্যের পরিচয় প্রসঙ্গে ধরা পড়েছে। তাই ভৌগলিক বিবরণ দানের পাশাপাশি সহজ সরল আঙ্গিকে জীবনী সাহিত্যে অনুগামী ভাষা মধ্যযুগের অপর এক বৈচিত্র্যপূর্ণ রীতি হয়ে উঠেছে।

তুলনায় জয়ানন্দের রচিত 'চৈতন্যমঙ্গল'-এ ষোড়শ শতাব্দীর যুগ প্রেক্ষাপটে, রাজনৈতিক ও ঐতিহাসিক একাধিক ঘটনার দৃষ্টিকোনে কাব্যটির ৯টি খন্ড ১৭৩টি অধ্যায় কবির পান্ডিত্যতা ও বৈদগ্ধ্যপূর্ণ ভাষাকে প্রকাশিত করেছে। ফলে 'চৈতন্যমঙ্গল'-এর ভাষায় ফার্সী ও হিন্দী শব্দ প্রবেশ করেছে জীবনী ভাষার পাশাপাশি যেমন --

"চরণ পরশে মুক্ত হইল তিলোত্তমা।
মধ্যে ফাটিল সেই পাষান প্রতিমা।।"

বৃন্দাবন দাসের চৈতন্য ভাগবত থেকে গৃহীত 'পাষাণ' শব্দটি প্রস্তর বা শিলাখন্ড অর্থে বোঝালেও স্থাপিত ভার বা make weigh রূপেই নির্দেশ করেছে আর এক্ষেত্রে পার্সী পাশন্গ্ শব্দ থেকেই 'পাষাণ' শব্দটি আগত হয়েছে।

'বন্দী', 'মোজা', 'কামান'-এর মত বেশ কিছু ফার্সী শব্দের মিশ্রণে 'চৈতন্য ভাগবত'-এর ভাষার ভাবগাম্ভীর্যতা ও আধ্যাত্ম মহাত্ম্যতাকে পরিস্ফূট করা হয়েছে। তাই 'চৈতন্যমঙ্গল' কাব্যটি আদ্যান্ত বিশ্লেষণে বেশ কিছু ভক্ত সাধক আচার্যের নাম যেমন স্পষ্ট হয় তেমনই অপর ভাষা (আরবী, ফার্সী, হিন্দী) থেকে ঋণ গ্রহণ করে সূক্ষ্ম ভিন্ন পথে হেঁটেছেন কবি জয়ানন্দ। ফলে তার রচিত সাহিত্য সম্ভারও অনবদ্য।

মধ্যযুগের অন্যতম সাহিত্য সম্পদ মঙ্গলকাব্যের ধারা। আর্য অনার্য সংস্কৃতির মিশ্রণে এবং মানুষের অবচেতন মনে সৃষ্টি হওয়া প্রাকৃতিক, ভীতি থেকে উৎপন্ন হওয়া মঙ্গলকাব্যেগুলির ভাষাও যথেষ্ট বৈচিত্র্যপূর্ণ। শুধুমাত্র দেবী মনসার পূজা প্রচার ও দেবী মাহাত্ম্যকে তুলে ধরতেই নয়, 'মনসামঙ্গল'-এর লৌকিক কাহিনী প্রস্ফুটিত হওয়ার দৃঢ়তা বলিষ্টতাই ভাষার আঙ্গিক হয়ে উঠেছে। আবার 'ধর্মমঙ্গল' কাব্যের শ্রেষ্ঠকবি ঘনরাম চক্রবর্তীর কবি ব্যক্তিত্বে কাব্যটি রাঢ়বঙ্গের একান্ত 'জাতীয় মহাকাব্য' হয়ে উঠেছে। তবুও কোথাও যেন আরবী ফার্সীর ব্যবহার এক্ষেত্রে স্বচ্ছন্দ ভাবনা প্রকাশে সরল ও প্রাণবন্ত হয়ে উঠেছে। সুপন্ডিত ব্রাহ্মণ কবি ঘনরাম চক্রবর্তী কবিরত্ন উপাধিতে ভূষিত। সুতরাং তিনি তৎসম শব্দের ব্যবহারে এমন সুমধুর, শব্দ নির্বাচন করেছেন এবং প্রয়োগকলায় শব্দগুলি কাব্য প্রতিভার সাক্ষ্য বহন করছে যে শব্দগুলি বৈদগ্ধ্যতার পান্ডিত্যে কাব্য মধ্যে ফুলহার সৃষ্টি করেছে। আরবী-ফার্সী শব্দের ঘনীভূত রূপ ও বিন্যাসে ধর্মমঙ্গল এর ভাষা হয়ে উঠেছে

বৈচিত্র্যপূর্ন। এই রকম বেশ কিছু ভাষার ব্যবহার মধ্যযুগের অন্যান্য কাব্য থেকে ধর্মমঙ্গলকে পৃথক করে তুলেছে। আবার, আরবী শব্দ 'মূলখ' শব্দ থেকে আগত 'মুলুক' শব্দটির ব্যবহার যত্রতত্র স্থানে হয়েছে।-

"তরণী উজান চলে তরঙ্গ সম্মুখ।
রাখিয়া দুদ্বারা পোতা ফিরিঙ্গী মুলুক।।"

'ইনাম' শব্দটি আরবী শব্দ 'ইলম', ফার্সী শব্দ 'মাহিয়ানা' থেকে আগত 'মাহিনা', শব্দগুলি তাই অচিরেই কাব্যমধ্যে স্থান পেয়েছে। অতি সহজ, বোধগম্য অথচ তৎসম শব্দের এক ভিন্ন রূপ এর মধ্যে দিয়ে ঘনরাম চক্রবর্তীর 'শ্রীধর্ম্মীমঙ্গল'-এর কাব্যভাগ বৈচিত্র্যপূর্ণ হয়ে উঠেছে। পাশাপাশি অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষার্ধে বিরচিত মানিক রাম গাঙ্গুলির ধর্মমঙ্গল কাব্যটির ভাষা পর্যালোচনা করলে তা যথেষ্ট বাস্তব চেতনালব্ধ ও প্রশংসাযোগ্য হয়ে উঠে। ১৭৮১ খ্রীষ্টাব্দের মানিকরাম গাঙ্গুলির গ্রন্থটির ভাষা যথেষ্ট আধুনিক। এ ভাষায় তদ্ভব শব্দের প্রাচুর্যতা তথা আধুনিক কোলকাতা কেন্দ্রিক অঞ্চলের ব্যবহৃত কথ্য ভাষার একাধিক উপাদান সংযোজিত হয়েছে। যেমন ---

১।। "ব্যস্ত হয়ে বিশ্বকর্তা এলেন তার কাছে।"
২।। "সহরের শিশুকে বরং ডেকে আনি।"
৩।।"কি করে পুত্রের মাংস খাব হাতে তুলে।"

অর্থাৎ সহজ সরল এভাষা আধুনিকতার ধার ঘেঁষে যাত্রা করলেও, রাঢ় বাংলার প্রচলিত শব্দ সমৃদ্ধ হলেও, এভাষাতেও অনুপ্রবিষ্ট হয়েছে আরবী-ফার্সী-ইংরেজী ভাষার বেশ কিছু শব্দ। 'জামা', 'নজর', 'জিন', 'নফর', 'চাকর', 'ফিকির', 'হুকুম', 'দাখিল' ইত্যাদি বেশ কিছু শব্দ আরবী ফার্সী শব্দ সহযোগে মানিকরামের ধর্মমঙ্গল এর ভাষা হয়ে উঠেছে বৈচিত্র্যপূর্ণ। তবে বোধগম্যতার দিক দিয়ে কোন জটিল রূপ ধারন করেনি একাব্যের ভাষা। দৃষ্টান্ত ---

১।। "ঐ মনি আন্দাজ করে অমৃতে ডুবিয়ে।
কুম্ভীরে ধরিল সেন ফিকির করিয়ে।।"
২।। "নয়নীর শ্বশুর যে গ্রামের মন্ডল।
দিগার কোটাল প্রজা সর্দার সকল।।"
৩।। "দ্বাদশ মোহর টাকা দিলেক সকল।
কোটাল বঙ্কিম পাইল কর্ণের কুন্ডল।।"

রাঢ়বঙ্গদেশের চলিত ভাষারীতির, অন্যতম লক্ষণকে অঙ্গে ধারন করে মানিকরাম গাঙ্গুলির 'ধর্মমঙ্গল' এর ভাষায় সেকালের কথা রূপ স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। তাই 'অকালে', 'দুজন', 'জামাই', 'কাঁকাল', 'সুন্দরী', 'মরিল' ইত্যাদি শব্দগুলি অবলীলায় স্থান পেয়ে গেছে। মানিক রামের কাব্যের ভাষায় সম্পূর্ণ চরণে খাঁটি চলিতের আধুনিক রূপও যেমন স্পষ্ট হয়েছে, তমনি 'লুম' প্রত্যয়ন্ত যে শব্দগুলি কলকাতা ও তার সংলগ্ন স্থানের ভাষার নিজস্ব সম্পদ, সেই সমস্ত শহুরে ও আধুনিক শব্দও স্থান পেয়েছে। যেমন 'আলুম', 'গেলুম', 'করলুম', 'হলুম' ইত্যাদি। আবার 'লাম' প্রত্যয়ন্ত ক্রিয়াপদের ব্যবহারও ভাষায় স্থান পেয়েছে। যেমন 'দিলাম', 'এলাম', 'পেলাম', 'মলাম' ইত্যাদি। আবার 'ছি', 'চি' সহযোগেও ক্রিয়াপদের ব্যবহার ভাষায় দেখা গেছে। যেমন 'করেছি', 'মেরেছি', 'শুনেছি', 'করেচি' ইত্যাদি। অর্থাৎ জড়তাহীন আধুনিক সহজবোধ্য চলিতরীতি ব্যবহারের পাশাপাশি তৎসম শব্দের আধিক্য ও তৎসঙ্গে আরবী ফার্সীর প্রয়োগে মানিকরাম গাঙ্গুলীর 'ধর্মমঙ্গল'-এর ভাষায় এসেছে বৈচিত্র্যের ছোঁয়া।

মঙ্গলকাব্যের এক অন্যতম শাখা চন্ডীমঙ্গল, যেখানে অনার্যদেবী চন্ডীর মাহাত্ম্য কীর্তনের মধ্যে দিয়ে মর্ত্যে পূজা প্রচারের চেষ্টা করা হয়েছে। কবি কোন সচেতনভাবে উচ্চবিত্ত বনিককূলের মধ্যে এবং নিম্নবিত্ত ব্যাধকূলের মধ্যে চন্ডীদেবীর পূজা প্রচারকে প্রচলন করে দিয়েছেন। দ্বিজমাধব বা মাধবাচার্য এই ধারার অন্যতম কবি হলেও এই ধারার সর্বশেষ কবিরূপে মর্যাদা দেওয়া যায় কবিকঙ্কন মুকুন্দ চক্রবর্তীকে। কারণ, তৎকালীন বঙ্গসমাজের প্রশাসনিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক গ্রাম্যব্যবস্থাকে তুলে ধরে মননশীল কবি এক আনুপুঙ্খ ঐতিহাসিক দলিল নির্মাণ করেছিলেন। শাসনতান্ত্রিক ক্ষেত্রে সুবেদারী ব্যবস্থা, উজিরদারদের

অত্যাচার, উজীরের প্রতাপান্বিত রক্তচক্ষুর সামনে পড়ে গ্রাম্য কৃষকশ্রেণী কিভাবে বঞ্চনার স্বীকার হয় - তাই কবি অত্যন্ত নিপুণতার সঙ্গে তুলে ধরেছেন চন্ডীমঙ্গল কাব্যে। ফলে, সমসাময়িক সমাজজীবনের রূপরেখা ভাষার নিপুণ কর্ষণার সঙ্গে একাব্যে প্রকাশিত হয়েছে। কবির চিন্তা-চেতনা, মননবোধ সর্বোপরি সমস্ত সমাজকে পর্যবেক্ষণ শক্তি দিয়ে দেখার প্রবণতার পাশাপাশি দুটি উপাখ্যানের মধ্যে দিয়ে নিটোলভাবনা, সুচিক্কন ভাষার মধ্যে দিয়ে রূপ প্রকাশ করেছেন। কাহিনী বয়নে উপাখ্যানের লক্ষণান্তকে অঙ্গীভূত করে চন্ডীমঙ্গলকাব্যের ভাষা কবি মনের আধার হয়ে উঠেছে।

মধ্যযুগের জনজীবনে হিন্দু ও ইসলাম সম্প্রদায়র অন্তরঙ্গ সাহচর্য সমাজ-ভাষার দিক থেকে বড় প্রাপ্তি বলা যায়। কারণ পারস্পরিক সাহচর্য এই দুই সম্প্রদায় যত পাশাপাশি অবস্থান করেছে, ততই বাণিজ্যিক সূত্রে, রাজনৈতিক সামাজিক প্রয়োজনে এক সম্প্রদায়, অপর সম্প্রদায়ের ভাষা, রীতিনীতিকে আত্মস্থ করেছে; হিন্দু ও মুসলিম উভয় সম্প্রদায়ের মেলবন্ধনে ব্যবহারিক ও সাহিত্যিক ভাষায় এসেছে মিশ্র সংস্কৃতির বহিঃপ্রকাশ। কবিকঙ্কন মুকুন্দের চন্ডীমঙ্গলকাব্যেও তাই আরবী ফার্সী তুর্কী শব্দের অবলীলায় অনুপ্রবেশ ঘটেছে কাব্যটি অন্ত্যমধ্যযুগের সমাজপ্রেক্ষাপটে তাই অনন্য হয়ে উঠেছে।

সমাজের বাস্তব ইতিবৃত্তকে কবিকঙ্কন চন্ডীমঙ্গল কাব্যে 'গ্রন্থ উৎপত্তির কারণ' অংশে বর্ণনা করার সময় বেশ কিছু ফার্সী শব্দকে সংযোজন করেছেন। যেমন ---

১।। "তাহার তালুকে বসি দামিন্যায় চাষ করি।
নিবাস পুরুষ ছয়-সাত।।"

২।।"সে মানসিংহের কালে প্রজার পাপের ফলে
ডিহিদার মামুদ সরিপ।।"

৩।। "উজির হল রায়জাদা বেপারিয়ে দেয় খেদা
ব্রাহ্মণ বৈষ্ণবের হল্য অরি।।"

উক্ত দৃষ্টান্তগুলি থেকে দেখা যায় প্রথম উদাহরণটিতে যে 'তালুক' শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে তা আরবী শব্দ 'তললুকহ' শব্দ থেকে গৃহীত হয়েছে এবং যার অর্থ হল জমিদারের কাছ থেকে বন্দোবস্ত করে নেওয়া, বা government-এর কাছ থেকে বন্দোবস্ত করে নেওয়া। এক্ষেত্রে কবির ছয় সাত পূর্বপুরুষ, দামিন্যায় চাষযোগ্য জমি কর্ষণের মধ্যে দিয়ে কৃষিকে জীবিকা হিসাবে গ্রহণ করেছিলেন, সেই প্রসঙ্গতই 'তালুক' শব্দটি জমিদারের কাছ থেকে বন্দোবস্ত করে নেওয়া অর্থে প্রযুক্ত হয়েছে। অতঃপর মানসিংহের সময়কালে মামুদ সরিপ যখন ডিহিদাররূপে নিযুক্ত হলেন তখন প্রজাদের পাপের ফল বলে এই নিযুক্ত করণ দেখলেন। এক্ষেত্রে 'ডিহিদার' শব্দটি ফার্সী শব্দ থেকে আগত। এবং তৃতীয় ক্ষেত্রে 'উজির' শব্দটিও আরবী শব্দ। যার অর্থ, কার্য পরিচালনার একটি পদ। কবি 'গ্রন্থ উৎপত্তির কারণ' অংশে এভাবে একাধিক আরবী-ফার্সী শব্দকে সংযোজন করেছেন। সমগ্র কাব্যের 'আখেটিক' এবং 'বণিকখন্ড' জুড়ে ফারসী 'বেশ', ফারসী শব্দ 'বন্দী', আরবী শব্দ 'বদল', ফারসী শব্দ 'দামামা', ফারসী শব্দ 'দফ্', ফারসী শব্দ 'বাজার' ইত্যাদি একাধিকবার ব্যবহৃত হয়েছে।

অর্থাৎ কবিকঙ্কন রচিত 'চন্ডীমঙ্গল'-এর শব্দ ব্যবহার রীতি বেশ আকর্ষণীয়। তবে একথা ঠিক যে শাসনকার্য পরিচালনার দায়িত্ব যদি ইসলাম সম্প্রদায়ের হাতে নিয়োজিত হয়, তবে স্বাভাবিক রাজ ভাষার অনেক শব্দ, রীতি জনসাধারণের লৌকিক ভাষার কিংবা সাহিত্যিক ভাষায় স্থান পায়। তাই ধ্রুপদী তৎসম শব্দ ব্যবহারের পাশাপাশি কাব্যাঙ্গিকে একাধিক আরবী-ফারসী-তুর্কী শব্দকে গ্রহণ করেছেন কবিকঙ্কন মুকুন্দ চক্রবর্তী। পৌরাণিক ও লৌকিক আদর্শের মেলবন্ধনে এই চন্ডীমঙ্গল কাব্যটি তাই ভাষাতাত্ত্বিক দৃষ্টিকোণে অনন্য হয়ে উঠেছে। কবির শব্দ নির্বাচিত অত্যন্ত পরিশীলতার প্রতীক হয়েছে। তাই তদ্ভব, অর্ধতৎসম শব্দের পাশাপাশি আঞ্চলিক শব্দকেও কবি ব্যবহার করেছেন অপ্রচলিত বেশিকিছু লৌকিক শব্দকে প্রয়োগ করে বাক্য নির্মাণের কুশলতা দেখিয়েছেন কবি। আবার অন্ত্য মধ্যযুগের ভাষাতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্যও কবির কাব্যে ফুটে উঠেছে। শুধু তাই নয়, মুসলমান সম্প্রদায়ের শ্রেণীবিভাগকে কবি আঙ্গিকে প্রবেশ ঘটিয়েছেন এবং মুসলমান সম্প্রদায়ের ধর্মকেন্দ্রিক, সমাজরীতিগত, পারিবারিক নিয়মনীতির মধ্যে উঠে এসেছে একাধিক মুসলিক সম্প্রদায়ের মধ্যে

প্রচলিত শব্দ সম্ভার, যা সাধারণত হিন্দু সম্প্রদায়ের ব্যবহারযোগ্য নয় অর্থাৎ কবিকঙ্কন মুকুন্দ চক্রবর্তীর চন্ডীমঙ্গল ভাষার দিক থেকে, অন্ত্যমধ্যযুগের এমন এক এক কাব্যে যা বর্তমানেও বহুল জনপ্রিয় চর্চিত।

রাজসভা কেন্দ্রিক কাব্য চিরকালই পাঠক সমক্ষে আদৃত হয়ে থাকে। মিথিলার রাজসভাশ্রিত বিদ্যাপতির আলংকারিক কাব্যচর্চা শুরু করে কুচবিহারের রাজসভা, ত্রিপুরার রাজসভা, বিষ্ণুপুর রাজসভা, কৃষ্ণনগর রাজসভা, বর্ধমান রাজসভা, আরাকান রাজসভার পৃষ্ঠপোষকতার বহু কাব্যসাহিত্য, কবি-আলঙ্কারিকগণ বঙ্গ সাহিত্য, সমাজে জনপ্রিয় আদৃত উজ্জ্বল হয়ে আছে। পশ্চিমবঙ্গের পূর্বাংশে চট্টগ্রামের আরাকান রোসাং রাজসভা এরকমই এক সাহিত্য সংস্কৃতি পীঠস্থান, যেখানে রাজ আনুকূল্যেও রাজ অমাত্যদের সহযোগিতার পৃষ্টপোষকতায় প্রেরনায় মধ্যযুগের অন্তিমে এক ব্যতিক্রমী দৃষ্টান্ত সৃষ্টি হয়েছিল। কারণ, ইসলাম কবিদের সুনিপুণ কর্ষণার লৌকিক প্রণয় উপাখ্যানের মধ্যে দিয়ে রোমান্স রস প্রবাহিত এমন এক ব্যতিক্রমী সাহিত্যধারার উন্মোচন হয়েছিল, যা নিঃসন্দেহে তৎকালীন যুগে অর্থাৎ মধ্যযুগের রুদ্ধ বাতায়নকে ভেদ করে বাংলা সাহিত্যে হঠাৎ আলোর ঝলকানিকে নিয়ে এসেছিল। অর্থাৎ প্রথাসর্বস্ব চিরাচরিত সংস্কারের মোড়ক ভেদ করে এই সকল প্রণয় উপাখ্যান পাঠন মনে ইসলাম সাহিত্য সম্পর্ক নবতর ভাবনাকে সংযোজন করেছিল। তাই অতি স্বাভাবিকভাবে আরাকান রাজসভার মুসলিম কবিদের রচিত বাংলা প্রণয় উপাখ্যানের মধ্যে স্থান পেয়েছিল প্রচলিত ইসলামী শব্দ, কিন্তু তা অধিকতর সমৃদ্ধতা লাভ করেনি। অর্থাৎ ইসলামী শব্দের অধিক বাহুল্যে ভাষা স্রোতহীন হয়ে পড়েনি; উপরন্তু আরবী-ফারসী শব্দের সুচারু প্রয়োগ কলায় ভাষা অনেক বেশী মার্জিত রুচিসম্মত ও আলংকারিক হয়ে উঠেছে। আরাকান রাজসভার একাধিক কবিপ্রবরের মধ্যে ‘লোরচন্দ্রানী ও সতীময়না’র রচয়িতা দৌলত কাজী ও ‘পদ্মবতী’র রচয়িতা সৈয়দ আলাওল অন্যতম, যাঁদের কাব্যে, ভাবে ভাবনায় ভাষার সৌকর্যে ধরা পড়েছে সপ্তদশ শতাব্দীর ভাষা ব্যবহারের বৈচিত্র্যতা।

‘লোরচন্দ্রানী ও সতীময়না’ কাব্যটি দৌলত কাজির মৌলিক রচনা নয়। মূল কাব্যটি হিন্দী ভাষায় রচিত। মিঞাসাধনের কাব্য অবলম্বনে দৌলত কাজি কাব্য রচনা করলেও কাব্যটির মধ্যে যে ভাষার প্রয়োগ করেছেন তাতে হিন্দী-আরবী-ফার্সীর প্রয়োগ থাকলেও তা সর্বস্ব প্রয়োগে প্রাধান্য লাভ করতে পারেনি। উপরন্ত কবির কাব্যে রোমান্স রসের প্রাধান্য থাকায় বাংলা শব্দ বৈচিত্র্যের সমন্বয়ে কবির ভাষার অন্বয় বন্ধন অনেকটাই ঐতিহ্যানুসারী হয়েছে বলা হয়। শৃঙ্গার রসের বর্ণনায় দৌলত কাজির কাব্যটি সুনিপুণ, যুদ্ধের বিবরণে নপুংশক বামুন ও রাজা লোরকের সমুখ সমর বর্ণনার মধ্যে দিয়ে মৌলিক হয়ে উঠেছে। অর্থাৎ সমগ্র কাহিনীর চমৎকারিত্ব স্পষ্ট হয়েছে জয়দেব ও বিদ্যাপতির প্রভাবযুক্ত দৌলতের কাব্যভাষায়। অন্ত্যানুপ্রসের ছান্দিক মাধুর্য ভাষায় ক্ষুরধার হয়ে উঠেছে। যেমন ---

“আয় দাই কুজনিকি মোকে শুনাওসি
বেদ উকতি নহে পাট;।
লাখ উপায়ে মিটাতে কে পারয়ে
যো বিধি লিখিয়ে ললাট;।।”

আবার কাব্য মধ্যে প্রবাদপ্রবচন রাজকীয় বিভূষণায় উপস্থাপিত হয়েছে,

১।। “যাহার নাহিক লজ্জা, কি ফল গঞ্জনা
তস্করেত ধর্মকথা বেশ্যাকে ভৎসর্না।।”
২।। “হেমন্ত অন্তরে যেন বসন্ত উল্লাস।”
৩।। “দারুণ পৃথিবী এই ব্যবস্থা তাহার।
এক যার আন আইসে কেহ নহে কার।”
৪।। “পুরুষ ভ্রমর জাতি মধু যথা পায়।
সুগন্ধি কুসুমনারী রসেতে খেলায়।।”
৫।। “যুবক পুরুষজাতি নিষ্ঠুর দূরন্ত।
এক পুষ্পে নহে জেনো মধুকর শান্ত।।”

অর্থাৎ কবির কাব্যে ভাষার বৈচিত্র্যে প্রকট হয়ে উঠে ভিন্ন আস্বাদ তবে হিন্দু নারীর একনিষ্ঠ প্রণয় অভিলাষ সম্পর্কে ভাষায় যে বৈদগ্ধ্যপূর্ণ পারদর্শিতা কবি দেখিয়েছেন, তা নিঃসন্দেহে রোমান্সরস বাহিত; ফলে 'লোরচন্দ্রানী'র পরিশীলিত ভাষায় রানী ময়নামতীর রূপ বর্ণনায় রোমান্টিক শব্দের ব্যবহার হয়েছে প্রচুর, এ স্থলে ভাষা হয়ে উঠেছে পরিশীলিত, সহজ-সরল, রোমান্টিক শব্দ নির্ভর, শ্রুতিমধুর ---

"কি কহিব দোহানের মনোরথ রঙ্গ।
কিছু শুনাইতে যুরায় যুদ্ধের প্রসঙ্গ।।
প্রথমে মদন কেলি ঘন আলিঙ্গন।
কামতাপে ভয় লজ্জা ধৈর্য পলায়ন।।
দন্তে দন্তে ঘরিষণ বদনে বদন।
পুলকে পুলকে তনু সঘন চুম্বন।।"

মানবিক প্রেমের আত্মোপলব্ধির গভীরতম স্তরকে প্রস্ফুটিত করে, রোমান্সরসের আধিক্যতায়, আরবী-ফারসী শব্দের নৈপুন্যতায়, সর্বপরি বাস্তব রসোজ্জ্বল চরিত্র নির্মাণের মধ্যে দিয়ে রূপসৌন্দর্যের মিলন-বিরহের বিমূর্ত ব্যঞ্জনায় ভাষা হয়ে উঠেছে অনবদ্য।

আরকান রাজসভাকে কেন্দ্র করে যে কবিযুগল অন্ত্যমধ্যযুগে প্রণয় উপাখ্যানের মধ্যে দিয়ে বঙ্গসাহিত্যের দরবারে উজ্জ্বল হয়ে রয়েছেন তাদের মধ্যে সপ্তদশ শতকের বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী ও সংস্কৃতিবান প্রাজ্ঞ আলাওল, নিঃসন্দেহে শ্রেষ্ঠতম কবির মর্যাদার অধিকারী। সপ্তদশ শতকে 'পদ্মাবতী' রচনার মধ্যে দিয়ে যে শিল্পকর্ম, পান্ডিত্য ও কবিত্বের পরিচয় দিয়েছিলেন তা নিঃসন্দেহে ভাষার লালিত্যকলায় অনন্য হয়ে রয়েছে। আলওল আরবী-ফারসী জানা মুসলমান কবি হলেও 'পদ্মাবতী' কাব্যে আরবী ফারসী শব্দের প্রয়োগ অল্প। 'স্তুতি খন্ড'-এর অন্তর্গত 'রসুল বন্দনা' অংশটিতে কোরান ও হাসিদের প্রভাব রয়েছে বলে সেখানে আরবী শব্দের কিছু নিদর্শন পাওয়া যায়। তবে পদ্মাবতী রূপসৌন্দর্যের বর্ণনায় অত্যন্ত সচেতনভাবে কবি শব্দের প্রয়োগ করেছেন। রোমান্টিক রস পরিবাহিত হয়ে 'পদ্মবতী রূপবর্ণন' খন্ডটির ভাষায় এসেছে এক অন্য আমেজ। রোমান্সরসের উৎস্রোত ঘটেছে কবি যখন বর্ণনা করেছেন এভাবে ---

"আজি সে নবিন রিহু রিতুপতি হইল রাজা।
সবে মিলি চলিলা করিতে দেবপূজা।
নানাবিধ প্রকারে করিলা সবে বেস।
সীথিতে সিন্দুর দিলা কুরালিয়া কেস।।"

"পদ্মাবতীর সুখমিলন খন্ড', 'বসন্ত খন্ড', 'রাজা রত্নসেন সতী খন্ড', 'রত্নসেন', 'পদ্মবতী বিবাহখন্ড' ইত্যাদি চতুঃখন্ডতে বৈচিত্র্যময় ভাবপ্রকাশও প্রাকৃতিক প্রেক্ষাপট-বিবরণের আধার হয়ে কবির লেখনীতে এসেছে। তৎসম শব্দবহুল ভাষার আধারে পরিবেশিত হলেও বর্ণনারীতির অন্তরে রোমান্টিক আমেজ এনে দেয়; ফলে বর্ণনারীতির বৈচিত্র্যে ভাষা রোমান্সরসে আধার হয়েছে। 'পদ্মাবতী'র ভাষার শিল্পপ্রকাশও প্রকরণ কুশলতা, বর্ণনাপ্রসঙ্গ সম্পর্কে বলা যায় 'কাফির', 'ইনাম', 'ছালাম', 'আর্জি', 'উমরা' ইত্যাদি ইসলামী শব্দের ব্যবহার হলেও ভাষার ঐশ্বর্যগুণ ও শ্রুতিমাধুর্যতা প্রকাশিত হয়েছে সহজ-সরল-বর্ণনারীতির গুণেও। আর এই ভাষা বৈচিত্র্যে তাই স্থান করে নিয়েছে বেশকিছু হিন্দী শব্দ। যেমন --- 'আরগুজা', 'উতারিয়া', 'ফেটিলা', 'গমনা', 'টোনা', 'ঠগ', 'লাড়ু', 'দোহাগ', 'পরেওয়া', বহির', 'ফুকার' ইত্যাদি শব্দ। অর্থাৎ অন্ত্য মধ্যযুগে বিশেষত সপ্তদশ শতাব্দীতে যুগপরিবেশে ধর্মীয় বাতাবরণকে ভেদ করে আলাওলের কাব্যে রোমন্স রসের উৎস্রোত তথা একাধিক রোমান্টিক ভাবনাধারী ভাষা নির্মাণ গ্রন্থটি অনন্য করে তুলেছে।

অষ্টাদশ শতকে রায় গুণাকর ভারতচন্দ্রের 'অন্নদামঙ্গল' এর ভাষা ও চিত্রকলা অন্যতম স্থান অধিকার করেছে। কাব্যটিতে আদিরসের উত্তেজক বর্ণনাগুণ, সৌকর্ষকতা লাভ করলেও সাহিত্য গুণ উপেক্ষণীয় নয়। অষ্টাদশ শতকের যুগচিহ্নকে ধারণ করে ঘটনার বিবরণ নৈপুণ্যতায় কৌতুকরস সৃষ্টিতে, গ্রন্থ সূচনায় ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট অঙ্কনে বিষেশত ভাষার মধ্যে শব্দ প্রয়োগ রীতিতে গ্রন্থটি চিরকালীন দরবারী সংস্কৃতিকে স্মরণ করায়। অসাধারণ দক্ষতার সঙ্গে বাক্‌বৈদগ্ধ্যতার সংমিশ্রণে গড়ে ওঠা ভারতচন্দ্রে শব্দ ব্যবহার রীতি

সম্পর্কে বলতে গেলে সর্বপ্রথম উল্লেখ করতে হয় যে, শব্দ নির্মিতিতে অনন্য ভারতচন্দ্র বক্তব্যকে সহজ-সরল ও সরলভাবে উপস্থাপন করেছেন কাব্যমধ্যে। খুব শ্লথ গতিতে যে ইসলামী শব্দ বাংলা শব্দের অন্তর্গত হয়ে তৎসম-অর্ধতৎসম তদ্ভবের পাশাপাশি স্থান করে নিয়েছে। 'অন্নদামঙ্গল'-এ তার প্রয়োগ স্পষ্ট হয়েছে। টালমাটাল এক ঐতিহাসিক পর্বের সাক্ষী কবি ভারতচন্দ্র তাই তৎকালীন দেশীয় সংকট ও ইতিহাসচেতন কবির মননে লালিত ছিল বলেই বাংলা শব্দ ব্যবহার করেই তিনি সীমাবদ্ধ থাকেনি, কাব্যমধ্যে তিনি একাধিক আরবী-ফারসী শব্দের প্রয়োগও করেছেন। এই শব্দ প্রয়োগের নৈপুণ্যতায় ও সুচারু প্রয়োগবলে কাব্যটি আভিজাত্যপূর্ণ হয়ে উঠেছে। যেমন --- আরবী-ফারসী শব্দের পাশাপাশি ভাষায় স্থান করে নিয়েছে একাধিক হিন্দী শব্দও। তবে তৎসম শব্দ ব্যবহারে কবি যথেষ্ট ঐতিহ্যানুসারী। তাই ভাষায় শ্লেষাত্মক কৌতুকপূর্ণ ব্যঙ্গভাবনা, যেমন কাব্যটিকে সরস করে তুলেছে, তেমনি বহুশ্রুত প্রশংসিত এই কাব্যের ভাষা শ্লীল-অশ্লীল রাজ আভিজাত্যের প্রতীক হয়েছে। দেশজ মৌখিক শব্দ, প্রবাদ প্রবচন, ধন্যাত্মক ও অনুকার শব্দ ব্যবহার করে, অনেকক্ষেত্রে পৌরাণিক কাহিনীর বর্ণনা করে 'ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গল'-এর ভাষায় সূক্ষ্ম শিল্পবোধ ধরা পড়েছে; তাই ভাষা হয়ে উঠেছে অনবদ্য।

সমগ্র মধ্যযুগের, বিস্তারিত কালপর্বের কয়েকটি নিদর্শনের মধ্যে দিয়ে তাই ভাষার বৈচিত্র্যময় বিবর্তনের রূপরেখাটি স্পষ্ট হয়ে ওঠে। আদিমধ্যযুগ ও অন্ত্য মধ্যযুগের ভাষার প্রভেদ রেখা তাই অতি সহজেই ধরা পড়ে। বড়ু চন্ডীদাসের 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন'-এর পথ বেয়ে যাত্রা করা ভাষা ভাবনা, কোথায় যেন 'চৈতন্য জীবনী সাহিত্যে'-এ এসে নবীনতা লাভ করে, অধিক বৈচিত্র্যপূর্ণ হয়ে উঠে, আভিজাত্যের স্পর্শে গৌরবে মধ্যযুগের ভাষা যেন নতুন রূপ পায়। মধ্যযুগের নির্বাচিত কাব্য সাহিত্যে ভাষায় প্রয়োগ কলার বৈচিত্র্যময়তা এভাবেই ধরাযায়।

## সহায়ক গ্রন্থপুঞ্জী :


১। ভট্টাচার্য অমিত্রসূদন, 'বড়ু চন্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্তন', দে'জ পাবলিশার্স, নবম সংস্করণ, মাঘ ১৪০৮।

২। সেন সুকুমার, 'ভাষার ইতিবৃত্ত', আনন্দ পাবলিশার্স, নবম মুদ্রণ, ২০০২, ডিসেম্বর।

৩। মজুমদার পরেশচন্দ্র, 'বাংলাভাষা পরিক্রমা (দ্বিতীয় খণ্ড) দে'জ পাবলিশার্স, প্রথম সংস্করণ, জানুয়ারি ১৯৯৩।

৪। হক ড. মুহম্মদ এনামুল, সম্পাদিত, সাহ মহম্মদ সগীর বিরচিত, 'ইউসুফ জোলেখা', তৃতীয় মুদণ, নভেম্বর ১৯৯৯, মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা।

৫। ভট্টাচার্য অমিত্রসূদন ও রাণা সুফলে সম্পাদিত 'শ্রীকৃষ্ণবিজয়', রত্নাবলী, প্রথম সংস্করণ, মাঘ ১৮০৯।

৬। গুপ্ত ক্ষেত্র, 'বাংলা সাহিত্যের সমগ্র ইতিহাস', গ্রন্থ নিলয়, চতুর্থ সংস্করণ, ২০০০ আগষ্ট।

৭। মজুমদার সুবোধ চন্দ্র, সম্পাদিত, 'কৃত্তিবাস রচিত সম্পূর্ণ' রামায়ণ, দেব প্রেস, শ্রাবণ ১৩৬৫।

৮। বসু সত্যেন্দ্রনাথ, সম্পাদিত, শ্রীচৈতন্যভাগবত, দেব সাহিত্য দুটির ডিসেম্বর ২০০১।

৯। দে ড. আশিসকুমার সম্পাদিত, 'ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গল' সাহিত্য সঙ্গী, প্রথম পরিবর্তিত সংস্করণ, ফাল্গুন ১৪১৩।

১০। শ ড. রামেশ্বর', 'সাধারণ ভাষাবিজ্ঞান ও বাংলা ভাষা', পুস্তক বিপনী, তৃতীয় সংস্করণ ১৪০৩।

১১। আহমদ্ওয়াকিল, 'বাংলা রোমান্টিক প্রণয়োপাখ্যান', খান ব্রাদার্স এণ্ড কোম্পানী, ঢাকা ১১০০, তৃতীয় প্রকাশন ১৯৯৫।

১২। নস্কর সনৎকুমার, সম্পাদিত, মুকুন্দ চক্রবর্তী কবিকঙ্কন চন্ডী, রত্নাবলী, দ্বিতীয় সংস্করণ, ১৯৯৯।

১৩। মজুমদার ড. অভিজিৎ, চন্ডীমঙ্গল (আমেটিক খণ্ড), সংগঠন ও শৈলী বিচার, দে'জ পাবলিশার্স, প্রথম প্রকাশ, ২০০৫।

১৪। মজুমদার বিমানবিহারী ও মুখোপাধ্যায় সুখময় সম্পাদিত 'জয়ানন্দ চিরচিত চৈতন্য মঙ্গল', The Asiatic society, প্রথম প্রকাশ ১৯৭১, Reprint ২০০৬।

১৫। মহাপাত্র পীযুষকান্তি, শ্রীধর্ম্মমঙ্গল (সম্পাদিত), কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৬২।
১৬। দত্ত বিজিত কুমার ও দত্ত সুনন্দা কর্তৃক সম্পাদিত, মানিকরাম গাঙ্গুলী বিরচিত ধর্মমঙ্গল, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৬০।
১৭। বন্দ্যোপাধ্যায় দেবনাথ, সম্পাদিত, 'লোরচন্দ্রানী ও সতীময়না', সাহিত্য সংসদ, দ্বিতীয় মুদ্রণ ২০০১।
১৮। বন্দ্যোপাধ্যায় দেবনাথ, সম্পাদিত, পদ্মাবতী (দ্বিতীয় খণ্ড) পশ্চিমবঙ্গ পুস্তক পর্ষদ, দ্বিতীয় মুদ্রণ, ফেব্রুয়ারী ২০০২।

সহকারী অধ্যাপিকা ও বিভাগীয় প্রধানা, দশরথ দেব মেমোরিয়্যাল কলেজ (গভঃ), লালছড়া, খোয়াই, ত্রিপুরা।